ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 137-146
www.athenajournalcbm.in

শওকত ওসমানের ছোটোগল্প: মুক্তিযুদ্ধের অনির্বাণ বহ্নিশিখা

মোরশেদুল আলম*

প্রাপ্ত: ১৬.১০.২০২৩ পরিমার্জন: ২৯.০৩.২০২৪ গৃহীত: ০১.০৫.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *এক সফল রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব-মানচিত্র বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের এই গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ যেমন সমগ্র বাঙালিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, তেমনি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতেও প্রভাব ফেলেছে তুমুলভাবে। তবে তুলনাসূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, উপন্যাস-কবিতা-নাটক কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা ছোটোগল্পের সীমিত শিল্প-অবয়বেই আমাদের কথাশিল্পীরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য শিল্পরূপ নির্মাণে বেশি মাত্রায় সফল হয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত জীবনের পূর্ণরূপ অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড রূপের প্রতি বাঙালি শিল্পীমানসের অধিকতর আকর্ষণ। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালে আবির্ভূত হয়েও স্বাধীনতা-উত্তরকালে যেসব গল্পকার বাংলা কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে সমানভাবে শ্রমনিষ্ঠ ও প্রযত্নশীল, তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুমহান চেতনার রাজনৈতিক-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করেছেন অসাধারণ দৃপ্ততায় ও প্রকাশনৈপুণ্যে। সঙ্গতকারণেই তাই মুক্তিযুদ্ধের অন্তর-বাহির আর বাঙালি জাতির অকুতোভয় দুর্বার সংগ্রামের বহুবৈচিত্র্যময় প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ নির্মাণ করেছে তাঁদের সংবেদনময় শিল্পীচৈতন্য; এবং এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর গল্পকারদের মধ্যে যাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাতিস্বিকতায় প্রোজ্জ্বল ও দীপ্তিবান যাঁর সমগ্র গল্পভুবন— তিনি শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)। শওকত ওসমানের ছোটোগল্পসমূহে বাংলাদেশের সুমহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য এবং বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের রূপায়ণ কতটুকু সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, সেটি অনুসন্ধানই এই বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।*

সূচক শব্দ: *বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, ছোটোগল্প, উত্তরাধিকার, শওকত ওসমান, শিল্পীচৈতন্য, প্রতিভাধর, সাফল্যমণ্ডিত।*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ।
পিএইচ.ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: malam2031973@gmail.com

দীর্ঘ নয়মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ সমগ্র বাঙালি জাতির জীবনে এক মহত্তম প্রাপ্তি। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় প্রেরণা আর প্রদীপ্ত চেতনা যেমন আমাদের সাহিত্যিকদের সৃজনশীল চৈতন্যে, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে, তেমনি তাঁদের মেধা, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ও প্রত্যাশা এবং স্বপ্নের দিগন্তকেও করেছে সুবিস্তৃত। তবে তুলনাসূত্রে উল্লেখ্য, উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা ছোটোগল্পের সীমিত শিল্প-অবয়বেই আমাদের কথাশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য শিল্পরূপ নির্মাণে বেশি মাত্রায় সফল হয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত জীবনের পূর্ণরূপ অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড রূপের প্রতি বাঙালি শিল্পীমানসের অধিকতর আকর্ষণ। অবশ্য এ-কথাও স্বীকার্য, 'ছোটোগল্পের সীমিত আয়তনে যে জীবন প্রতিবিম্বিত হয় তা খণ্ড খণ্ড হলেও সমগ্রের অংশ; ব্যক্তির স্বতন্ত্র শিল্প-অন্বেষা সেখানে সামূহিক জীবনচৈতন্যেরই অন্তর্ময় অনু-পরমাণু।'[১]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রবীণ ও নবীন—উভয় ধারার গল্পকারই মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধ-অনুষঙ্গবাহী প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেছেন; এবং শিল্পমানের দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোটোগল্প কালোত্তর মহিমায় অভিষিক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবেদনা, হাহাকার, অবরুদ্ধ সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ ছবি একদিকে যেমন গল্পকাররা এঁকেছেন শৈল্পিক নৈপুণ্যে, অন্যদিকে তেমনি তুলে ধরেছেন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্বগাথা, অপরিমেয় দুঃসাহস ও নিখাদ দেশপ্রেম। তাঁদের গল্পসমূহে যেমন বিধৃত হয়েছে পাক-হানাদার দস্যু ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পৈশাচিক বর্বরতা ও নির্মমতার বিবরণ, তেমনি অন্যদিকে সদ্যস্বাধীন দেশে স্বপ্নভঙ্গের মনোবেদনা, নিদারুণ হতাশা এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বল চেতনা অবমাননার সকরুণ চিত্রও উঠে এসেছে বিভিন্ন গল্পে, বিভিন্ন ভাবে। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়:

'আমাদের অনেক ছোটোগল্পকার স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী ও আবেগ—অনুভূতিকে কেন্দ্র করে তাঁদের ছোটোগল্পগুলি রচনা করেছেন। কোনো কোনো গল্পে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ হানাদার বাহিনী দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যে অকল্পনীয় গণহত্যা অভিযান চালিয়েছিলো, তার ইতিবৃত্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে গেরিলা বাহিনীতে সংগ্রামরত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন তড়িৎগতি আক্রমণের কাহিনি, কোনো গুরুত্বপূর্ণ টিলা অধিকার করার জন্য জীবনপণ করা লড়াই-র বর্ণনা, হাসিমুখে দেশের জন্য আত্মাহুতি দেবার প্রেরণাদায়ী ছবি প্রভৃতি। আর কোনো কোনো গল্পে পাই স্বাধীনতা অর্জনের পরবর্তী একটি স্তরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের পুনরুত্থানের পটভূমিতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের মানুষদের আশঙ্কাজনিত তীব্র মনোবেদনা, দুঃখ ও জ্বালা এবং নতুন এক মুক্তিযুদ্ধের জন্য সঙ্কল্পের ছবি, যে যুদ্ধের পরিণতিতে জয়যুক্ত হবে সর্বহারার আদর্শ।'[২]

সঙ্গতকারণেই এ-কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ছোটোগল্পে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের বিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে সর্বব্যাপী হতাশা, নির্বেদ ও বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্যে সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি- কোনো কোনো ছোটোগাল্পিকের রচনায় এ-জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধোত্তর ছোটোগল্পসাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক,[৩] সন্দেহ নেই। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর-বাহির আর বাঙালি জাতির অকুতোভয় দুর্বার সংগ্রামের বহুবর্ণিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ নির্মাণ করেছে আমাদের এই ছোটোগাল্পিকদের সৃষ্টিশীল শিল্পীচৈতন্য; এবং এঁদের মধ্যে যাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রাতিস্বিকতায় প্রোজ্জ্বল যাঁর গল্পভুবন—তিনি শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮)।

বিভাগ-পূর্বকালেই একজন সফল ও নন্দিত ছোটোগাল্পিক হিসেবে শওকত ওসমানের দীপ্র আবির্ভাব ঘটে বাংলা কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে। তাঁর প্রথম ছোটোগল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকে। চল্লিশের দশক থেকে নব্বুইয়ের দশক পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আবহ তাঁর ঐসব ছোটোগল্পমালায় বন্দি হয়ে

আছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায়। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে রচিত শওকত ওসমানের ছোটোগল্পসমূহে সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ এবং উপকরণ ও উপাদান এসময় অঙ্গীভূত হয় তাঁর ছোটোগল্পের জৈবদেহে। ব্যঞ্জনাধর্মী রূপক ও প্রতীকের আশ্রয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক ছোটোগল্পগুলিতে শওকত ওসমান প্রায়শই প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাস্রোত; এবং সেই চিন্তাস্রোতে সিক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর ছোটোগল্পের সমুদয় পুরুষ ও নারীরা। এক আশাবাদী সদর্থকচেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর সৃষ্ট মুক্তিসংগ্রামী চরিত্রপুঞ্জ প্রায়শই মানবিক মহিমায় জাগ্রত হয়, নেতি আর নাস্তির বিপ্রতীপ জগতে বাস করেও তারা ইতিবাচক ও সদর্থক এক জীবনবোধে উজ্জীবিত হয়ে ঘোষণা করে মানবতারই জয়গান।

বিষয় ও ভাবের দিক থেকে শওকত ওসমানের ছোটোগল্পমালায় যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি ভাষা-ব্যবহার এবং উপস্থাপনরীতিতেও মুক্তিযুদ্ধের বহুবৈচিত্র্যময় প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের জ্যোতির্ময় উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাঁর ছোটোগল্পে বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন ভাবে— কখনো সরাসরি একাত্তরের বহু রক্তাক্ত ঘটনাপুঞ্জ ছোটোগল্পের বিষয় হয়েছে, কখনো-বা তাঁর ছোটোগল্পের মৌলভাব সৃষ্টি হয়েছে পরোক্ষভাবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে। তাঁর কোনো কোনো ছোটোগল্পে উচ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষীয়দের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং বিপক্ষীয়দের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ; আবার কখনো-বা এসব গল্পের বহিরঙ্গে লেগেছে মুক্তিযুদ্ধের স্পর্শ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় হিংস্র, বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সর্বস্তরের নিরীহ বাঙালিদের ওপর চালিয়েছিলো অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন। অনেক সময় তাদের অত্যাচার, নৃশংসতা ও বর্বরতার মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেত যে তা হিটলার-চেঙ্গিস খাঁকেও হার মানিয়ে দেয়। বাংলাদেশের সুস্থ, সবল, সতেজ ও প্রাণোদীপ্ত তরুণরাই ছিলো ঐ হিংস্র শ্বাপদদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু মূলত— শওকত ওসমানের 'আলোক-অন্বেষা' গল্পটি একাত্তরের ভয়াবহ সেই দিনগুলির একটি বাস্তব কথাচিত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সালামৎ আলি তার এলাকার এক জাঁদরেল রাজাকারের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে। ধৃত ও বন্দি হবার পর 'স্মৃতির পঙ্গপাল' যেন ছেয়ে ফেলে পাক-হানাদারদের নির্যাতন কক্ষে হাতকড়া পরা ও চোখে কালো কাপড় বাঁধা অবরুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা সালামৎ আলির 'মগজের চারপাশ'। পাকিস্তানি মিলিটারির পদলেহনকারী এদেশীয় দালাল-রাজাকারের:

'বিশ্বাসঘাতকতা তাকে জল্লাদের হাড়িকাঠে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ঘাগী মুসলিম লীগারের মুখটা সে দেখতে পেল। ফিচেল ছুঁচোলো মুখ, কৃশ চেহারা। তাই আবার বেঁটে-খাটো এই শুয়োরের বাচ্চা তার প্রভুদের কায়দায় নামের শেষে বিক্রমপুরী জুড়েছিল। ধূর্তামি ওর চোখে-মুখে স্পষ্ট।...মহৎ নামে পরিচিত হতো, কিন্তু সব সময় সে সমাজ বিরোধীদের দোসর।...

এই বয়সে, ষাটের ঊর্ধ্বে এখনো বিক্রমপুরী কারো ক্ষতি সাধন, বিশেষত দেশের ক্ষতি সাধন করবে, বাংলাদেশ যখন কসাইয়ের দোকান-তা ভাবা যায়নি। কিন্তু সেই-ই তার পাঞ্জাবি প্রভুদের আমন্ত্রণ দিয়ে এনেছিল এই অঞ্চলে।'[৪]

নির্যাতন কক্ষে সালামৎ আলি স্মৃতি-বিস্মৃতির সীমাহীন অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতে আটচল্লিশ ঘণ্টা এভাবেই বসে থাকে বন্দি অবস্থায়। তবে 'দু-বার শাস্তির রোলার তার দেহের ওপর দিয়ে ঘষড়ে ঘষড়ে কিছু কাপড়, কিছু রক্ত, কিছু ছাল তুলে নিয়ে গেছে'[৫] ইতোমধ্যেই। তার একান্ত ইচ্ছে হয় হাত দিয়ে একটি বার চোখের পাতা স্পর্শ করতে, কিন্তু সম্ভব হয় না। অভুক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে সালামৎ আলির মনে হয়:

'দেহ-যন্ত্রের আর কোনো চাহিদা নেই। কেবল চোখ বেয়াড়া জিদ্দী ছেলের মতো বায়না নিয়ে মেতে আছে— আলো, এতটুকু আলো দাও। অতি ঝাপসা। হিম প্রত্যুষের কুয়াশালেপা ক্ষীণতম আলো, যা চোখ তেড়ে ধরতে হয়, এমন আলো। এই প্রার্থনার জবাবে কিছু অন্ধকার কেবল ধেয়ে আসে, ঘনীভূত হয়— শেষে পুরু কালো পর্দার সামনে ঝুলে থাকে; আর নড়ে না।'[৬]

অতঃপর নিজের সাথে যুদ্ধ করে অনেক কষ্টে 'চোখ তেড়ে কালো ফেটির মধ্যে দিয়ে তাকাতে গেলে সালামৎ আলির মনে হলো— মস্তিষ্কের ভেতর কোথায় যেন কি ছিঁড়ে গেছে এবং তার পক্ষে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। কিন্তু যদি চোখ মেলে চাইতে পারতো, তাহলে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য কিছু ছিলো না।'[৭] প্রতি মুহূর্তে তার মন এক ফোঁটা আলো দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে; কিন্তু কাকে অনুরোধ করবে সে চোখের বাঁধন খুলে দেয়ার জন্য? পাঞ্জাবি সৈন্যদের? কিন্তু মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় সালামৎ আলি বুঝে ফেলেছে— 'কুকুরের মধ্যেও মানবিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। আর তার সঙ্গী দশজন পাঞ্জাবি সিপাই, এগুলো মুসলমান! এরা কুকুরের কাছাকাছি কোনো কালেও যেতে পারবে না।'[৮] তবুও শেষ পর্যন্ত সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঘৃণা ও ব্যক্তিত্বের বাধা দূরে সরিয়ে একজন সৈনিককে চোখের কালো ফেটি খুলে দেয়ার অনুরোধ জানায় সালামৎ। অতঃপর:

'—তোম্ রোশনাই মাংতা?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আব তোমহারা ফেটি খোল্ দে তা।

ব্যাকুলতা সালামৎ আলির আঙুলগুলো মৃদু কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, যেন সকালের হাওয়া।...

একটানে সালামৎ আলির চোখের ফেটি খুলে গেল। আগ্রহী, অধীর বন্ধ চক্ষুর ফেটি উন্মোচন-মাত্র তার মনে হলো যেন জ্বলন্ত তীর অক্ষিপটে এসে বিঁধলো। মাথায় বোঁ বোঁ চক্কর অতি দ্রুত এবং ক্রমশ বেগ-বর্ধিত হুঁশের বুনিয়াদ ভেঙে খানখান করে ফেলছে।'[৯]

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধা সালামৎ আলি 'চেতনার স্বাক্ষর পাঠ করে ফেললো নিমেষেই। জায়গাটা টর্চার চেম্বার'। আর মাথার ওপর জ্বলন্ত পাঁচশ পাওয়ারের বাল্বটা যেন চিৎকার করে তাকে বলছে— 'দুশমনের কাছ থেকে করুণা ভিক্ষা করো না। হয় তাদের ধ্বংস করো, অথবা ধ্বংস হও।'[১০]

সময়ের ভগ্নক্রমিক ব্যবহার, স্মৃতিময়তা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমান্তরাল বিন্যাস 'আলোক-অন্বেষা' গল্পটির কাহিনিকে করেছে গতিময়। বন্দি, নির্যাতিত, অনিশ্চিত ভবিতব্য ও মৃত্যুতাড়িত মুক্তিযোদ্ধা সালামৎ আলির স্মৃতিগুচ্ছ, অনুভবরাশি ও অভিজ্ঞতাসূত্রে কয়েক ঘণ্টার ঘটনাবৃত্তে অত্যন্ত সুনিপুণভাবেই রূপায়িত হয়েছে গল্পকারের মুক্তিযুদ্ধ-কেন্দ্রিক শিল্প-অভিপ্রায়।

শওকত ওসমানের 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' গল্পের মেদহীন আয়তনে বিন্যস্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত ঘটনাপ্রবাহ, অবরুদ্ধ সময়ের আতঙ্ক, চাপা ভয়, গুঞ্জন, হত্যা ও লুণ্ঠনের নারকীয় পরিবেশ এবং যুদ্ধকালীন সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের বহুমাত্রিক বিপর্যয়, পরাভব ও ট্রাজিক বেদনা। এ-গল্পের কাহিনিবৃত্তে আমরা দেখি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ক্যাপ্টেন বশীর তার সৈন্যদল নিয়ে সহসাই একদিন বাংলাদেশের চৌষট্টি হাজার গ্রামের একটিতে ঝটিকা সামরিক অভিযান চালায়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো— কতিপয় দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা-কর্তৃক ঐ এলাকায় চলাচলের একমাত্র পাকা সড়কের প্রধান ব্রীজ উড়িয়ে দেয়ার ফলে অফিসারসহ চারজন পাকিস্তানি সৈনিকের নির্মম মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ। ভোর হবার পূর্বেই পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন বশীরের লেলিয়ে দেয়া হানাদার বাহিনী পুরো গ্রামটি ঘিরে ফেলে। তারপর শুরু হয়:

'অপারেশন। নির্বিচার হত্যা, অগ্নিদাহ, লুট। রমণীর চিৎকার, আর্তনাদ, আগুনের লেলিহান শিখা, প্রাণভীত মানব-মানবীর দৌড়, বেয়নেটে গাঁথা শিশু, মেশিনগানের খট্ খট্ রব-নারকীয় তাণ্ডবের নানা অধ্যায়। বিরাট গ্রাম। বহুজন-অধ্যুষিত। ঝোপঝাড়, বাঁশবনে পরিপূর্ণ। অনেক সময় লেগেছিলো। একতরফা যুদ্ধ।

এখানে প্রতিবাদ শুধু হাহাকার, ক্রন্দন এবং অবধারিত মৃত্যুর মুখে পৃথিবীকে এক লহমা দেখার আকুলতা-স্নেহ, মায়া, মমতার সকল বন্ধন ছেঁড়ার অসম্ভব প্রয়াস।

বড় গ্রাম, তাই শেষ হয়েও শেষ হয় না। লুটের জন্য আরো বিলম্ব ঘটে। ধ্বংসের লেলিহান জিভ তাই সংযত করতে হয় কোনো এক সময়। এক হিসেবী সিপাইয়ের হিসেব অনুযায়ী শিশু-নারী-পুরুষ মিলে পাঁচশ মৃত, দু'হাজার অন্তত জখম।'[১১]

—এই অপারেশন চালাবার আগে ক্যাপ্টেনের সৈন্যরা রেললাইনের পাশ থেকে 'লিকলিকে রোগা' কিন্তু অকুতোভয় এক কলেজ ছাত্রকে ধরে নিয়ে এলে ক্যাপ্টেন তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো—'ডরতি নেহি?' সেই নির্ভিক তরুণ ছাত্রটি নির্ভয়ে উত্তর দিয়েছিলো—'কিঁউ?' বারংবার জিজ্ঞেস করেও ক্যাপ্টেন বশীর যখন সেই কলেজ-পড়ুয়া তরুণটির কাছ থেকে একই উত্তর পায়, তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে ওঠে বশীর—'কিয়া ডরতা নেহি?' তার এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি শীর্ণদেহী কয়েদি; বরং 'সোজাসুজি ক্যাপ্টেনের চোখের দিকে তাকিয়েছিলো। বড় অদ্ভুত দৃষ্টি। সেখানে চ্যালেঞ্জের কোনো ভঙ্গি নেই, ঘৃণা নেই, ভীতি নেই। অসহায়তার লেশমাত্র অনুপস্থিত। চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলো প্রশ্নকর্তা।'[১২] কিন্তু তার পরদিন জেল হাজতে লাশ পাওয়া যায় তরুণটির। সবাই বলাবলি করছিলো 'জওয়ানদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির ফলে নাকি দুই সিপাই তাকে বেদম লাথি দিয়েছিলো।'[১৩]-এই সংবাদ শুনে ভয়ানক ক্ষেপে ওঠে ক্যাপ্টেন বশীর; সব সিপাইকে এর জন্য চরম শাস্তি পেতে হবে বলেও হুমকি দেয় সে। কিন্তু যখন একজন সৈন্য সাহস করে বলেছিলো—'আপ জানতে নেহি এই বাঙ্গালী কা বাচ্চালোগ কিয়া হ্যায়'? তখন সম্বিত ফিরে পায় যেন ক্যাপ্টেন; তার মনে হয় একবার 'মৃত লাশের চোখ দু'টো সে দেখবে- তেমনি দীপ্ত, রহস্যময় কিনা। কিন্তু আর সাহস পায়নি।'[১৪]

আবেগময়তার মধ্যেও ঘটনা ও উপঘটনার বাস্তবতা 'বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া' ছোটোগল্পে যেন ইতিহাসের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে হীরকোজ্জ্বল দীপ্তিতে।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় শওকত ওসমানের 'দুই বিগ্রেডিয়ার' একটি প্রাতিস্বিক সংযোজন। এই অনবদ্য ছোটোগল্পটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় আমরা দেখি, একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে হিংস্র পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামসদের লাগানো আগুনের লেলিহান শিখায় যখন জ্বলছে সমগ্র ঢাকা নগরী, তখন আগুন নেবানোর কর্তব্যবোধে দমকল বাহিনীর এক দেশপ্রেমিক বাঙালি অফিসার বিগ্রেডিয়ার ময়ীদ ভুঁইয়া সেই বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর নিকষ অন্ধকারে তার জীপ নিয়ে ছুটে যায় নিকটস্থ ফায়ার স্টেশনে। অতঃপর কালক্ষেপণ না করে ফায়ার স্টেশনে অবস্থানরত সকল সহকর্মীকে নিয়ে সে এগুতে থাকে লকলকে আগুনের শিখা লক্ষ করে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করতেই বিগ্রেডিয়ার ময়ীদ ভুঁইয়ার দমকলের গাড়ির ওপর যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হলো:

'সাঁজোয়া গাড়ির একটি ছোট শেল এসে ফেটে পড়লো। সোজা হীট্। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাশ ফায়ার। দমকলের বিরাট গাড়িটা ছিটকে পড়ে একদিকে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। সমস্ত ফায়ারম্যান যে ক'জন ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো। কারো কারো লাশ গাড়ির ওপর, কারো বাংলাদেশের মাটির আশ্রয়ে'।[১৫]

বিগ্রেডিয়ার ময়ীদ ভুঁইয়ার বুকও অত্যাধুনিক রাইফেলের গুলিতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। একটা পাকিস্তানি মিলিটারি জীপ প্রচণ্ড গতিতে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনেকটাই আশাবাদী হয়ে ওঠে আহত ময়ীদ; প্রাণপণ কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে সে—'ভাইয়ো অফিসার...অফিসার'। তার মর্মভেদী চিৎকারে:

'মিলিটারি জীপ তার পাশে এসে থামলো।...

বিগ্রেডিয়ার আসলাম নামের এক অফিসার ভুঁইয়ার জীপের কাছে এসে দাঁড়াতেই জখমী কণ্ঠে যতদূর গ্রাম বাড়ানো চলে, তেমনই পর্যায়ে ভুঁইয়া বললো, 'ভাইলোগ, আপলোগ মেরা সব ফায়ার ম্যানকো কিঁউ মারা? হামলোগ সব ডিউটি মে নিকালা। শহরমে আগ লাগা...হামলোগ সব ফায়ার ব্রিগেড কা আদমী।'...

'ডিউটি করনে আয়া?'দ

'হ্যাঁ।'

'ডিউটি?'—আসলামের সঙ্গী অফিসারটি হেসে উঠলো।...

এবার দুই অফিসার প্রায় একসঙ্গে খেঁকিয়ে উঠলো, 'শোনো বাঙ্গালীকো বাচ্চা, হাম ভী ডিউটি মেনিকালা। মেরা আব ডিউটি হ্যায় আগ লাগানা, জায়সা তোমহারা হ্যায় বুজানা। সমঝা?'[১৬]

এরপর আর কী-ই বা বলার থাকে! মৃত্যুপথযাত্রী বিগ্রেডিয়ার ময়ীদ ভুঁইয়াও আর কোনো প্রশ্ন করবার কিংবা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় পায়নি। 'সারা জীবনের শিক্ষা হয়তো তার সামনে বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মতো খাড়া হয়েছিলো'[১৭] তখন।

শওকত ওসমানের 'দুই বিগ্রেডিয়ার' গল্পের ময়ীদ ভুঁইয়ার নির্মম পরিণতির মধ্যে এই রক্তাক্ত 'প্রশ্নচিহ্ন' একাত্তরের পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াল কালরাত্রির যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির ইঙ্গিতবাহী। মানবিক দায়িত্বচেতনা এবং পৈশাচিকতার মাত্রাভেদ এ-গল্পের মৌল উপজীব্য হলেও, একটা মানবিক জিজ্ঞাসার লেলিহান রক্তশিখা শেষাবধি অনিঃশেষ বেদনায় থাকে অম্লান।

নাজেম নামক এক আহত গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার অসম দুঃসাহসিকতার শৈল্পিক রূপায়ণ শওকত ওসমানের 'রক্তচিহ্ন' গল্পের মৌল উপজীব্য। 'অ্যাম্বুশ' করতে বেরিয়েছিলো নাজেমসহ আরো আটজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ করছিলো তারা বেশ কিছুদিন যাবত। অনেক প্রতীক্ষার পর অবশেষে যখন প্রায়ই তাদের হাতের মুঠোয় চলে এসেছিলো হানাদার সৈন্যরা, ঠিক তখনই তাদের ভাগ্যটা যেন বেঁকে বসলো। অকস্মাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে একটা গুলি এসে হাত ও পা—দু'টিই জখম করে দিয়ে যায় নাজেমের। 'তার দলের সঙ্গীরা কোথায়? তারা কি যুদ্ধের ময়দানে শহিদ অথবা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সহজে কোথাও ওৎ পেতে সরে গেছে?'[১৮]—নাজেম বুঝতে পারে না। তখনো 'এলো-পাতাড়ি গুলির আওয়াজ চলছে থেকে থেকে। কিন্তু নাজেম স্থির নেই। এগোচ্ছে এক হাত ও পা সম্বল করে, যতদূর এবং যত তাড়াতাড়ি সরে পড়া যায়।'[১৯] কেননা, বর্বর হিংস্র পাকসেনারা রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে গেছে তখন; যেকোনো সময় তাকে খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসতে পারে এদিকে। সঙ্গতকারণেই তাই যত দ্রুত সম্ভব এক হাত আর এক পা সম্বল করে এই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে সে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে গ্রামের শত শত নিরীহ মানুষের প্রাণ নষ্ট করবার তো কোনো অধিকার নেই তার। তাই:

'আহত মুক্তিযোদ্ধা নাজেম, বাংলা জননীর বীর সন্তান স্বেচ্ছায় কোনো গ্রামের দিকে সে কেন যাবে? রক্ত ঝরছে তার শরীর থেকে। রক্তের দাগ তো মুছতে পারবে না সে।...

রক্তের দাগ ধরে ডালকুত্তা শিকার খুঁজে বের করে। দুর্ভাগ্য, আজ সে শিকার। ডালকুত্তারা তার হদিসে এগিয়ে আসবে না, তা হয় না। এই ডালকুত্তারা আবার মানুষ; কুকুরের চেয়ে হিংস্র এবং আক্কেল ঢের বেশি। তাই আরো ভয়। রক্তের দাগ ধরে ধরে কোনো গ্রামে পৌঁছলে ঐ পাঞ্জাবি জানোয়ারেরা সব পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

আরো কত মানুষ... অসহায় নারী... প্রাণভয়ে আর্তনাদ করছে, দৌড়চ্ছে, দাউ দাউ জ্বলছে গ্রাম।'[২০]

'আমার মৃত্যু আরো শত শত মৃত্যুর কারণ হোক, না... না'—সহসাই নাজেমের চিন্তাস্রোত ছিন্ন হয়ে যায়; 'খুব জোর পাঁচশ গজ দূরে' আছে ওরা। কিন্তু নাজেম এরই মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায়, নিয়ে ফেলে জীবনের চরমতম সিদ্ধান্ত। তার কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিলো একটি হাতবোমা। এবং সেই:

'হাতবোমাটা সে অতি কষ্টে রক্ষা করেছিলো বুক পকেটে সযত্নে রেখে, হাজার ঝুঁকি যদিও। সে-টা বাম হাতের মুঠির মধ্যে ঠিক আছে। দাঁত দিয়ে পিন্ খুলতে কোনো কষ্ট নেই।...

ফাঁকা মাঠ। ফ্লাশ লাইটে দিনের মতো। দেখতে কিছু অসুবিধা নেই।

খেঁজুর গাছটা বেড় দিয়ে একটু পরে এগোতে লাগলো পাঞ্জাবি সৈন্যরা।'[২১]

—এবং এর কিছুক্ষণ পরেই একটি হাতবোমা বিস্ফোরিত হলো প্রচণ্ড শব্দে 'কিছু মানুষের মিলিত আর্তনাদসহ'।

শওকত ওসমান 'রক্তচিহ্ন' গল্পে নাজেম চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিসত্তার অমিত সম্ভাবনাকেই শিল্পময় করে তুলেছেন মূলত। যে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, তারই কয়েকটি অকুতোভয় ও তেজোময় প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ ছড়িয়ে আছে এই গল্পের পরতে পরতে। আমাদের স্বাধীনতা-সূর্যের আলোকপিয়াসী সেইসব অমৃতের সন্তানেরা এখানে তাদের অপরাজেয় শৌর্যগাথা ও হৃদয়ানুভবের এক আশ্চর্য উজ্জ্বল আলপনা এঁকে রেখেছে যেন। স্বদেশের স্বাধীনতা আর সামূহিক মুক্তির অগ্নিস্পর্শে দীক্ষিত হয়ে একদিন যারা খাঁটি সোনা হয়ে উঠেছিলো—শওকত ওসমানের 'রক্তচিহ্ন' গল্পটি বুকে ধারণ করে আছে তাদেরই বীরত্বের অমরগাথা।

মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামসদের হিংস্র বৈরী নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত ব্যক্তিমানসের বহুমুখী সঙ্কট, বহুভুজ জটিলতা, আতঙ্কগ্রস্ত-ভীত মানবসত্তার নির্জিত বিপন্ন-বিধ্বস্ত জীবন, তাদের শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষোভ ও হার্দিক যন্ত্রণা এবং পরিণামে বাঙালি জাতিসত্তার এক প্রোজ্জ্বল, দীপ্তিময় ও ইতিবাচক জীবনচেতনায় ক্রম-উত্তরণ শওকত ওসমানের 'ক্ষমাবতী' গল্পটির মৌল উপজীব্য। এই গল্পটি একজন দুঃখী মেয়ে তামিনার সংবেদনময় জীবনের কাহিনিচিত্রও বটে। পাঁচ বছর বয়সে তামিনা তার মা-কে হারায়। পিতা তমিজ মিয়া অত্যন্ত আদর, যত্ন আর স্নেহে বড়ো করে তোলে তাকে। এক ছোট্ট গাঁয়ে বাপ-মেয়ের ছোট্ট সুখের সংসার। তামিনার বয়স যখন পনেরো বছর, তখন শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। তাদের নিস্তরঙ্গ সুখী জীবনে যেন এই স্বাধীনতা যুদ্ধ আবির্ভূত হয় এক ভয়াল বিভীষিকারূপে। বাংলাদেশের আর শত-সহস্র গ্রামের মতো তামিনাদের গ্রামেও অপারেশনে আসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। তাদের বিকৃত যৌনকামনার সর্বগ্রাসী ছোবল থেকে কন্যাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় নিরক্ষর তমিজ মিয়া; পাঁচজন পাকিস্তানি বর্বর পশুর হিংস্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় পনেরো বছর বয়সী কিশোরী তামিনার অপুষ্ট যৌবন। প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র কন্যার এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে চিৎকার করে কাঁদতেও পারে না তমিজ মিয়া। কারণ, তখন চিৎকার করে কাঁদা অর্থ— 'তার কাছাকাছি পাটক্ষেতে আত্মগোপন করে থাকা আরো ত্রিশ-চল্লিশ জনের মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলা।'[২২] এই উভয়-সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে গল্পকার শওকত ওসমান অসহায় তমিজ মিয়ার আত্মখনন, আত্মদহন ও তার রক্তাক্ত অন্তর্বেদনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মর্মন্তুদ, হার্দিক রক্তক্ষরণে স্নাত:

'আর্তনাদ যখন গলার ওপারে থাকে, তখন বুক-পাঁজরের কী দশা হয়, ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বর্ণনা দিতে পারবে না। সাদা দাড়িসহ তমিজ মিয়া মুখ মাটিতে ঘষছিলো বারবার। যেন জননী বাংলাদেশের বুকের কাছে তার সকল বক্ষভার নামিয়ে সে-ও মাটির সান্নিধ্য-সহযাত্রী হবে; পরে কেউ তাকে দাফন দিক।'[২৩]

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিপ্রতীপ সময়ে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পাক-হানাদারদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে ভারত-অভিমুখে লক্ষ লক্ষ মানব-মানবীর অক্লান্ত যাত্রার চলমান চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে 'ক্ষমাবতী' গল্পে। একাত্তরের সেই দুঃসহ ও দুঃস্বপ্নময় বিপ্রতীপ দিনগুলিতে নিজ বসতবাটি থেকে উন্মূলিত, উদ্বাস্তু নর-নারীর কাছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত যেন তখন হয়ে উঠেছিলো আশ্রয় ও নির্ভরতার এক স্বপ্নরাজ্য:

'নানা পথের সঙ্গম-ধারায় শুধু জনতার স্রোত। সকলেই নিরাপত্তার তল্লাশী। কারো চেনা-জানা আত্মীয় বাড়ি, কারো অন্য গ্রাম। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে একই লক্ষ্যবার্তা— 'বর্ডার পার হও, যত পারো। জলদি।

সেখানে প্রতিবেশী ভারতের বুক পাতা আছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী পূর্বেই জায়গা পেয়ে গেছে। ইজ্জত এবং সম্পদ লুটের আতঙ্ক থেকে অন্তত তারা নিরাপদ। অতএব, চলো...চলো।'[২৪]

—একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিপ্রতীপ রক্তাক্ত জীবন, সমাজ ও সময়প্রবাহের এই অন্তঃশীলা প্রাণাবেগকে রাজনৈতিক ও মানবিক অভিজ্ঞান থেকে অবলোকন করেছেন গল্পকার শওকত ওসমান; আর এ-কারণেই তাঁর ছোটোগল্পসমূহে জীবনোপলব্ধির বিচিত্রমাত্রা উপনীত হয় নবতর প্রতীক-সত্যে।

বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, সীমাহীন অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নি-সংযোগ এবং ভয়াল বিভীষিকাময় পশুশক্তির অবরোধ-বেষ্টনী ঘেরা একাত্তরের বাংলাদেশের একটি মর্মন্তুদ খণ্ডচিত্র অঙ্কিত হয়েছে শওকত ওসমানের 'জননী: জন্মভূমি' গল্পের সীমিত ক্যানভাসে। একাত্তরের কোনো এক সময় দুঃসাহসী গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাদের মাইন বিস্ফোরণে জীপ উল্টে আট-দশ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হলে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে তাণ্ডবলীলা শুরু করে দেয় অন্যান্য পাকসেনা এবং তাদের পদলেহী এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশামসরা; জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয় তারা পুরো গ্রাম। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জনশূন্য গ্রামে শুরু হয় খানা-তল্লাশী। কোথাও কেউ নেই; শুধু ভিটে-মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা একটি বাড়িতে

তিন বৃদ্ধাকে দেখতে পায় ওরা। এই তিনজনের মধ্যে কসিমন বিবি ছিলো সত্তর ঊর্ধ্ব; বাকি দু'জন—আলিমন বিবি ও খাতু বিবির বয়সও সত্তর ছুঁই ছুঁই। সঙ্গতকারণেই নারীদেহ-লোভী পাকসৈন্যদের হাতে ইজ্জত হারাবার কোনো ভয় ছিলো না তাদের। তাই 'একগাদা রাজাকার এবং খানসেনা যখন ঘরে ঢুকলো', তখন 'তিন বৃদ্ধা আদৌ ঘোমটা টানে নি। সব পোলাপানের বয়সী। এদেরকে কাছে লজ্জা কী!'[২৫] গ্রামে পা দিয়েই নারীদেহ-লোভী পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন তাজ খাঁ যুবতী মেয়ে খোঁজ করছিলো। রাজাকাররা তাকে জানায়—গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়ে গেছে বলে এই গ্রামে কোনো যুবতী মেয়ে পাওয়া যাবে না আজ। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাজ খাঁ কিছুতেই সহজে দমে যাবার পাত্র নয়; তার স্পষ্ট উত্তর—'শালা হাম লেকিন ছোড়নেওয়ালা বান্দা নেহি'। অতঃপর ঐ তিন বৃদ্ধার ঘরে প্রবেশ করে তাজ খাঁ:

'খানসেনাদের হুকুম দিলো—'এই দেখো, তোমহারা ঐ দো বুডঢিকো ইন্টারোগেট করো, বাহার লে যাও। হাম ইয়ে বুডঢি (কসিমন বিবির দিকে তর্জনী)-কো ইন্টারোগেট করুংগা।'

এবার তিন বৃদ্ধার মধ্যে সত্যি আলোড়ন ওঠে—যা আদিম ভয়েরই পুনরাবৃত্তি।...

ঘরের ভেতর আর্তনাদ উঠেছিলো বৈকি।

অসহায়ের এই আর্তনাদ নতুন নয় পৃথিবীতে।'[২৬]

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী মুসলীম লীগের কতিপয় দালাল এবং চার প্ল্যাটুন পাকিস্তানি সৈন্য প্রবীণ সারেঙ সোলেমানসহ তার কর্মচারীদেরকে বন্দুকের নলের মুখে ধরে এনে তাদের সহযোগিতায় স্টিমারে করে মেঘনা নদী পাড়ি দিয়ে কুলিয়ার চর থেকে বৈদ্যেরবাজার এলাকায় অপারেশনে যাবার লোমহর্ষক চিত্র রূপায়িত হয়েছে শওকত ওসমানের 'সারেঙ সুখানী' গল্পে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে এবং কতকটা নিরুপায় হয়েই দেশপ্রেমিক সারেঙ সোলেমান তাদেরকে কুলিয়ার চর থেকে বৈদ্যেরবাজার নিয়ে যেতে রাজি হয়। স্টিমার যখন মাঝ নদীতে, ঠিক তখনই নদীতীর থেকে অকস্মাৎ ভেসে আসে মুক্তিযোদ্ধাদের গুলির আওয়াজ এবং হতভম্ব পাকিস্তানি সৈন্যরা কিছু বুঝে উঠবার আগেই সারেঙ সোলেমান ও তার কর্মচারীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘনার উত্তাল বুকে। কিন্তু নদীতে ঝাঁপ দিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি সারেঙ সোলেমান; পাক-মিলিটারিদের নিক্ষিপ্ত গুলি তার দেহ ঝাঁঝরা ও ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে:

'ঝাঁপিয়ে পড়ার পর বাংলার নদী কিছুক্ষণ আলিঙ্গনে আলিঙ্গনে সারেঙকে নিয়ে লোফালুফি করেছিলো, লাল হয়ে উঠেছিলো পানির সমতল প্রৌঢ় মানুষের রক্তে।

একসময় তলিয়ে যেতে হয় সমস্ত বারিরাশির স্নেহের ভেতর, যখন নির্বাত হয়ে আসে অতলান্ত মেঘনার অন্তর্জগৎ।'[২৭]

তবে মৃত্যুর মুখে নিজেকে সঁপে দেয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে সোলেমান সারেঙের বুক ভরে ওঠে এক পরম তৃপ্তিতে; আর কিছুক্ষণ পরেই 'সুটবুটধারী প্রায় দেড়শ বিদেশি শত্রু মেঘনার থাবার মুখে কুকুরের মতো চিৎকার দিয়ে উঠবে মৃত্যুর অপচ্ছায়া দেখে।'[২৮] কেননা, উত্তাল মেঘনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার অনেক আগেই তার স্টিমারের তলার নলমুখ খুলে দিয়েছিলো সে। মাত্র কিছু মুহূর্তের অপেক্ষা; পুরো স্টিমার জলে পরিপূর্ণ হতে বেশি দেরি নেই আর।

'সারেঙ সুখানী' গল্পটির কাহিনি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে গল্পকার শওকত ওসমানের প্রাতিস্বিকতা নিঃসন্দেহে সাফল্যের প্রান্তবিন্দুস্পর্শী। বলাবাহুল্য, এ-গল্পে সারেঙ সোলেমানের ক্রিয়াকর্ম এবং তার অনুভবগুচ্ছের মধ্য দিয়ে গল্পকার শওকত ওসমান মূলত সৃজন করেছেন অবরুদ্ধ ভূখণ্ডের স্বাধীনতার স্বপ্নচিত্র।

শওকত ওসমানের 'তিন মির্জা' গল্পে সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত পটভূমিকায় ঢাকার এক মির্জা পরিবারের পরম্পরাগত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। একদা বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলো এই মির্জা পরিবার। তারপর কালের নির্মম চাকায় পিষ্ট হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তারা পরস্পর থেকে। তবে ব্রিটিশ আমলে বাংলার রাজনীতিতে এই মির্জা পরিবারের কোনো কোনো মির্জার ভূমিকা ছিলো দেশাত্মবোধের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সিপাহী বিদ্রোহের 'একশ বারো বছর পরে' যখন পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়, তখন সেই রক্তক্ষয়ী রণাঙ্গনে মির্জা পরিবারের শেষ চিহ্ন, পঞ্চম পুরুষ মির্জা আলি আশ্রার তার মুক্তিবাহিনীর গেরিলা

দল পরিচালনাকালে পাকিস্তানি সৈন্যদের মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে আহত হয় এবং নিজের পরিণামের কথা না ভেবে তার সহযোদ্ধাদের কোনো এক নিরাপদ স্থানে সরে যাবার জন্য নির্দেশ দেয় সে। বুলেটবিদ্ধ মির্জা আশ্রার কখন মারা গেল, সেই বর্ণনা দেন নি গল্পকার; তবে মির্জা তার গেরিলাযোদ্ধাদের যে কথাটি বলেছিলো, তা স্পর্শ করে যায় আমাদের চৈতন্যের ভূমিতল:

'বন্ধুগণ, তোমরা কেউ কেউ ভাবতে পারো—শত্রুর হাতে আমার লাশ পড়বে। তা পড়ুক। পরে তোমরা পুঁতে দেবে মাটিতে। জননী বাংলাদেশের মাটির বুকে ঘুমোবো, তার চেয়ে প্রশান্তিময় আর কী আছে দুনিয়ায়! কুইক মার্চ।'[২৯]

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সামূহিক নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও পাশবিক হামলার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে মুক্তিসংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং তাতে মির্জা আশ্রার-এর মতো অসংখ্য দেশপ্রেমিক গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার যে দ্বিধাশূন্য আত্মদান ঘটে— সেই করুণ, অথচ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্মৃতিচারণে আবেগের প্রকাশ হতে পারে এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। একারণেই 'তিন মির্জা' গল্পে আমরা যখন দেখি গল্পকারের আবেগময়তার ছাপ একটু বেশি মাত্রায়ই পড়েছে কাহিনি বর্ণনায়, তখন সেই নির্বাধ চিত্তবৃত্তীয় প্রকাশকে সংবেদনশীল শিল্পীমননের উৎসারণরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। কেননা, একাত্তরের রাজনীতির সামূহিক বিশৃঙ্খলা, বিপর্যস্ততা, বৈপরীত্য, বৈফল্য ও অরাজকতায় মর্মান্তিকভাবে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সম্ভ্রম আর অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে এদেশের শত-সহস্র স্বর্ণসন্তান আত্মোৎসর্গের বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে যখন আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্দ্বিধায়—কালের সেই নির্মম, অথচ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস যেকোনো স্পর্শকাতর বাঙালির অন্তর্মানসে আবেগের ফল্গুধারা সৃষ্টি করে অনিবার্য নিয়মেই।

মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাহী ছোটোগল্পসমূহে কাহিনি-বিন্যাস এবং চরিত্রায়ণ পদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনার নেপথ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে শওকত ওসমানের যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান, সমাজসংলগ্নতা, মেধাবী পর্যবেক্ষণ ও মানববীক্ষণশক্তি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটোগল্পমালায় যেমন একদিকে রূপায়িত হয়েছে যুদ্ধকালীন ভয়াল দিনরাত্রির ইতিকথা, যুদ্ধক্ষত ও রক্তাক্ত ব্যক্তিমানসের ভীতি, আতঙ্ক, নির্জিত বিপন্ন জীবনপ্রবাহ, সর্বস্তরের বাঙালির শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষোভ ও যন্ত্রণা, হিংস্র পাকিস্তানি নরপশুদের নির্বিচারে পীড়ন-নির্যাতন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মর্মান্তিক চিত্র; তেমনি অন্যদিকে শিল্পিত হয়েছে মাতৃভূমির জন্য নিবেদিতপ্রাণ অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সংগ্রাম। বলাবাহুল্য, শওকত ওসমানের সংবেদনশীল শিল্পীমানস কেবলমাত্র তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটোগল্পগুলির বহিরঙ্গে রঙ ফুটিয়েই তৃপ্ত থাকেনি, বরং সেই প্রসাদগুণ ছোটোগল্পগুলির মজ্জায় মজ্জায় সংযত আবেদন, বাহুল্যবর্জন ও ইঙ্গিতময় সৌকর্যে অন্তর্লীন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সমাজমুখী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অবলোকন শক্তিতে পরিস্নাত। ফলে, তাঁর মুক্তিযুদ্ধাশ্রয়ী ছোটোগল্পগুলি একদিকে যেমন হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের সার্থক ও শৈল্পিক কথাচিত্র, অন্যদিকে তেমনি হয়ে উঠেছে একাত্তরের বিশ্বস্ত দলিল।

সূত্র নির্দেশ:

১. খান, রফিকউল্লাহ, (১৯৯২), মুক্তিযুদ্ধ ও আমাদের কথাসাহিত্য, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন, সংখ্যা-৪৩, পৃ. ২১।
২. চৌধুরী, কবীর, (১৯৮৯), (সম্পা.), মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের সাহিত্যকর্ম, *সমকালীন বাংলা সাহিত্য*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ৫৮।
৩. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, (১৯৯৪), (সম্পা.), ছোটোগল্প, *বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ*, নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগার, পৃ. ২৯৪।
৪. ওসমান, শওকত, (১৯৭৫), আলোক-অন্বেষা, *জন্ম যদি তব বঙ্গে*, মুক্তধারা, পৃ. ৩।
৫. *তদেব*, পৃ. ৭।
৬. *তদেব*, পৃ. ৯।
৭. *তদেব*, পৃ. ১১।
৮. *তদেব*, পৃ. ১৩।

৯. *তদেব*, পৃ. ১৫।
১০. *তদেব*, পৃ. ১৬।
১১. ওসমান, শওকত, বারুদের গন্ধ লোবানের ধোঁয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।
১২. *তদেব*, পৃ. ২১।
১৩. *তদেব*, পৃ. ২৩।
১৪. *তদেব*, পৃ. ২৫।
১৫. ওসমান, শওকত, দুই বিগ্রেডিয়ার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭।
১৬. *তদেব*, পৃ. ৩৬।
১৭. *তদেব*, পৃ. ৩৮।
১৮. ওসমান, শওকত, রক্তচিহ্ন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।
১৯. *তদেব*, পৃ. ৪৩।
২০. *তদেব*, পৃ. ৪৬।
২১. *তদেব*, পৃ. ৪৮।
২২. ওসমান, শওকত, ক্ষমাবতী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।
২৩. *তদেব*, পৃ. ৫৬।
২৪. *তদেব*, পৃ. ৬১।
২৫. ওসমান, শওকত, জননী: জন্মভূমি, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬।
২৬. *তদেব*, পৃ. ৬৯।
২৭. ওসমান, শওকত, সারেঙ সুখানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।
২৮. *তদেব*, পৃ. ৭৯।
২৯. ওসমান, শওকত, (১৯৮৬), তিন মির্জা, *এবং তিন মির্জা*, বর্ণবিচিত্রা, পৃ. ৪২।